দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

কোটার ছোবল থেকে মেধাবীদের রক্ষা করুন

মো. মাসুদ রানা

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিত বেকার তরুণদের কাছে 'কোটা' শব্দটি সবচেয়ে বিষময়—যাতনাময় একটি শব্দ। ছোটবেলা থেকে অনেক কষ্টে পড়াশোনা করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর চাকরির বাজারে তারা হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে কয়েক জোড়া জুতার তলা ক্ষয় করে ফেলে, তবুও চাকরির দেখা সহজে পায় না। একদিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের ত্রুটি (কর্মমুখী শিক্ষা না হওয়া), অন্যদিকে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কোটা—এই দুইয়ের কারণে বেকার মেধাবী তরুণরা আজ ক্লান্ত, হতাশাগ্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কোটা থাকলে যেখানে খুব সহজেই চাকরি পাওয়া যায় সেখানে কোটাবিহীন শিক্ষিত বেকারদের হতাশা, ক্ষোভ জন্মানোটা স্বাভাবিক। এই কোটা নিয়ে ফেসবুক, পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হচ্ছে তবুও দেশের হর্তা-কর্তাদের টনক নড়ছে না।

বেশ কয়েকদিন আগে ৩৮তম বিসিএসের সার্কুলার প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২০২৪টি পদের মধ্যে ১১৩৪টি পদই কোটা দিয়ে পূরণ হবে। বাকি ৮৯০টি পদ মেধা থেকে পূরণ করা হবে। ভাবা যায়, দেশের সবচেয়ে বড় চাকরির পদগুলোর ৫৬ ভাগ কোটাধারীদের দ্বারা পূরণ হবে। মেধাবীদের মূল্যায়ন করা পুরোপুরি হবে না। এ কেমন দেশে বসবাস করি আমরা! যেখানে মেধার চেয়ে কোটাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ঘুষ, দুর্নীতি তো আছেই। সব মিলিয়ে হিসাব করে দেখি, বাংলাদেশে সরকারি চাকরি কোটাধারী, মামা-খালুধারী লোকের জন্য, প্রকৃত মেধাবীদের জন্য নয়।

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও চাকরিগত বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। যার ফলে এই সুজলা, সুফলা, সুন্দর নদীবিধৌত একটি সোনার বাংলাদেশ পেয়েছি আমরা। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরে দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য কমলেও চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়ে গেছে।

স্বাধীনতার পর দেশের সব নাগরিককে সমানভাবে চাকরির সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা পদ্ধতি চালু করা হয়। পরবর্তীতে এর সাথে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা যুক্ত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটার ভিত্তিতে ৫৫ শতাংশ এবং মেধায় ৪৫ শতাংশ নিয়োগ দেওয়া হয়। এই ৫৫ শতাংশের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০ শতাংশ, জেলা কোটা ১০ শতাংশ, নারী কোটা ১০ শতাংশ, উপজাতি কোটা পাঁচ শতাংশ। যদি এই ৫৫ ভাগ কোটা পূরণ না হয় তবে সেখানে এক শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কোটার মাধ্যমে এত বেশি নিয়োগ হয় কিনা আমার জানা নাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান কখনো ভোলার নয়। তাদের সম্মানার্থে বর্তমান সরকার তাদের মাসিক ভাতাসহ সব ধরনের নাগরিক সুবিধা দিয়ে আসছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ করেছে। এই কোটা কি আসলেই ফলপ্রসূ? তাহলে চলুন, দেখে নেই।

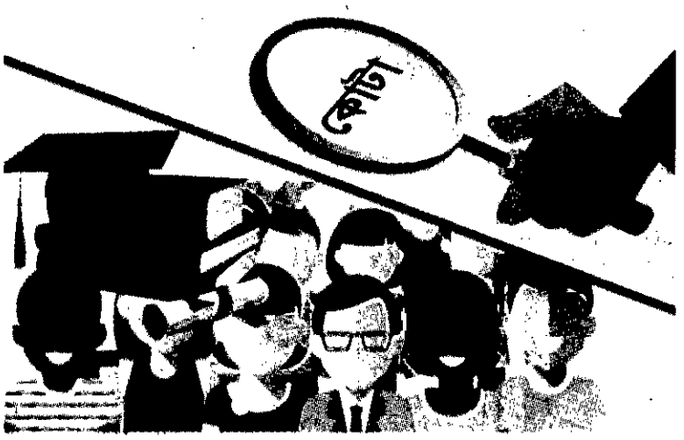

দেশের বড় বড় চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা (যেমন : বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষা) সম্পন্ন হওয়ার পর যখন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয় তখন দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় অনেক পোষ্ট ফাঁকা থেকে যায়। তাহলে দেশে কি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কিংবা নাতি-নাতনির অভাব? নাকি তারা উচ্চ শিক্ষিত নয়?

দেশের মাঝে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা প্রচুর রয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রাজাকাররাও টাকা ঘুষ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নিয়েছে। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ভীড়ে আসল মুক্তিযোদ্ধা কে তা চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। পত্র-পত্রিকায় এ রকম অনেক রিপোর্ট দেখেছি যে, আসল মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে অঙ্গহানি হয়ে কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে কাজ করতে না পেরে ভিক্ষা করে দিনযাপন করছে। তারা দিনের পর দিন মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে অথচ তাদের স্বীকৃতি হয় না। সরকার সম্প্রতি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ছাঁটাই-বাছাইকরণের পদক্ষেপ হাতে নিয়েছিল। জানি না কতটুকু সফলতা এসেছে এতে। যেখানে মানুষটি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কি না তার গ্যারান্টি নেই, সেখানে কিভাবে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা ফলপ্রসূ হবে? এই কোটা তখন তো ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার ছেলে-মেয়েরা কাজে লাগাবে।

দেশের ০.১৩ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা রাখাটা কি ঠিক? আবার মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য যদি শুধু এই কোটা রাখা হতো তবে তা কিছুটা সহনীয় হতো। কিন্তু তাদের নাতি-নাতনিদের জন্য কোটা সুবিধা রাখা একদম অনুচিত।

এবার আসি নারী কোটায়। দেশের উন্নয়নে নারীরা আজকে আর পিছিয়ে নেই। তারা আজকে পুরুষের মতো দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এসব বক্তব্য সমাজপতিদের মুখ থেকে শোনা। এখন প্রশ্ন হলো, নারীরা যদি পুরুষের সাথে সমানভাবে তাল মিলিয়ে চলে তবে কেন নারীদেরকে দুর্বল, অবলা ভেবে তাদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা রাখা হয়েছে? ১০ শতাংশ কোটা রাখার মানে এই নয় কি যে, আমরা নারীদেরকে এখনো দুর্বলই ভাবছি?

বর্তমান সময়ে দেশের সব জেলায় জেলা কোটার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ যে জেলা উন্নত তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জেলার জন্য জেলা কোটা রাখা যেতে পারে।

বাংলাদেশের সব সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে কোটার দৌরাত্ম্য থাকায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো তুলনামূলকভাবে কম মেধাবীদের দ্বারা পূরণ হয়ে যাচ্ছে। দেশকে পরিচালনা করতে মেধাবী মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজন। একটি দেশের উন্নয়নে এসব মেধাবী মানুষের গুরুত্ব কতটুকু তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাংলাদেশে যদি এভাবে মেধাকে মূল্যায়ন না করে কোটাকেই মূল্যায়ন করার রীতি চলতে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে, তা সহজেই বুঝতে পারি আমরা। দেশের নেতৃত্ব প্রদানে যোগ্য লোকের অভাব দেখা দেবে। তাই কোটা পদ্ধতির বিশেষ সংস্কার প্রয়োজন।

আমার মতে, কোটা পদ্ধতির সংস্কারে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ১৫ শতাংশ, নারী কোটা পাঁচ শতাংশ, জেলা কোটা পাঁচ শতাংশ, প্রতিবন্ধী কোটা দুই শতাংশ, উপজাতি কোটা পাঁচ শতাংশ রাখা যেতে পারে। নতুন সংযোজন হিসেবে, সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস থেকে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত ছিটমহলবাসীদের জন্য তিন শতাংশ কোটা যোগ করা যেতে পারে। এই হিসাবে বিভিন্ন কোটায় ৩৫ শতাংশ এবং মেধায় ৬৫ শতাংশ নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিদের কোটা বাদ দেওয়া উচিত।

বর্তমান সরকারকে কোটা সংস্কার করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। আর যদি তা না করা হয় তবে বর্তমান সরকারের উপর থেকে দেশের ২৬ লাখ শিক্ষিত বেকার মুখ ফিরিয়ে নিবে। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে 'মেধার মূল্যায়ন সর্বাগ্রে' এ রকম ঘোষণা দিয়ে এই ২৬ লাখ বেকারের কাছে জনপ্রিয় হয়ে যাবেন।

এটুকু বিবেচনা করে হলেও আমাদের মতো সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের কোটার ছোবল থেকে রক্ষা করুন।

● লেখক: শিক্ষার্থী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর